

# প্রবাসে দেশী রাজনীতি

শামস্ রহমান

ব্লাদিমির লেনিন, আয়াতুল্লাহ খোমেনি এবং ইয়াসের আরাফাত। তিনজন ভিন্ন ভিন্ন সময়ের তিন পুরুষ। ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী তিন রাজনীতিক। তবে একটি বিষয়ে তাদের অদ্বুত মিল। রাজনৈতিক কারণে তারা প্রত্যেকে প্রবাসে কাটিয়েছে দীর্ঘদিন। লেনিন ফিনল্যান্ড, জার্মানী সহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে। খোমেনী ফ্রান্স এবং আরাফাত লেবানন সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। নিজ দেশে নিষিদ্ধ ছিল তাদের মতাদর্শের রাজনীতি। ফলে আশ্রয় নিয়েছে প্রবাসে। সেখানে বসে সাংগঠনিক তৎপরতাসহ চালিয়েছে রাজনৈতিক কর্মকান্ড। যথোচিত সময়ে আবার ফিরে আসে নিজ নিজ দেশে এবং দেশ পরিচালনা করে সক্রিয়ভাবে।

প্রচলিত অর্থে ‘রাজনীতি’ contextual, যা রাষ্ট্রের অবস্থান, রাষ্ট্রীয় সীমানা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা প্রয়োগের পরিধি দ্বারা বেষ্টিত। Context’এর বাইরে এলেই রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়। প্রচলিত সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত ‘রাজনীতি’র উদ্দেশ্য নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আহরন এবং জনগনের সেবা প্রদান। প্রবাসে বাংলাদেশী রাজনীতির রাষ্ট্রও নেই, নির্বাচনও নেই। আর ক্ষমতায় আহরনের চিন্তা নির্ধাত বোকামী। ভাবাও অবাস্তব এবং অবাস্তব। তারপরও কেন প্রবাসি বাংলাদেশীদের বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে এত যোগাযোগ? উত্তর কোরিয়া বা চায়নার মত বাংলাদেশে ভিন্ন মতাদর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ নয়। মিয়ানমার বা জিম্বাবুয়ের মত রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সীমাবদ্ধতাও নেই সেখানে। বরঞ্চ, স্বইচ্ছায় অভিবাসনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বাঙালি বসবাস করছে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর বহু দেশে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিবাসিরা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আর কোনদিনই হয়তো ফিরবে না বাংলাদেশে। এককথায়, বাংলাদেশীদের অবস্থা লেনিন, খোমেনি বা আরাফাতের মত নয়। তাহলে তো স্বদেশই হবার কথা তাদের দেশী দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্র! যুক্তিযত কথা।

এ যুক্তি আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি না কোন অস্ট্রেলিয়ানকে বাংলাদেশে লেবার-লিবারেল-ন্যাশনালের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার দলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে। অথবা বিলেতিদের অস্ট্রেলিয়ায় লেবার-কংগ্রেস-সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি খুলে বসতে। এমনকি ভারতীয়দের মাঝে কংগ্রেস বা বিজেপির শাখা-প্রশাখার কোন কথা শোনা যায় না সচরাচর। তবে কেন প্রবাসে বাঙ্গালিদের দেশী রাজনীতি?

পাশাপাশি এটাও সত্য, অনেকে এ ধারার বিরোধী। তাদের মতে -

(এক) প্রবাসে বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতি চর্চা অর্থহীন।

(দুই) রাজনীতিতে আগ্রহীরা প্রবাসের মূলধারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।

মন্তব্য দুটি আমাদের অনেককেই ভাবায়।

যারা প্রবাসে দেশী দলীয় রাজনীতির বিরোধী, তাদের দুটি মন্তব্যের দ্বিতীয়টির সাথে আমি একমত। রাজনীতিতে আগ্রহীরা ধীরে ধীরে প্রবাসের মূলধারা রাজনৈতিক কর্মকালন্ডের সাথে নিজেদের জড়াতে পারে। রাজনীতির সিড়ি বেয়ে তাদের উর্ধাগমন উচ্ছল করবে কমিউনিটির মুখ। এ ব্যাপারে বিলেত-প্রবাসি বাঙ্গালিরা কিছুটা এগিয়ে। তবে তাদের লেগেছে দীর্ঘদিন। অন্যান্য প্রবাসে এ প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ঘটুক সেটাই আমার কাম্য।

দ্বিতীয় মন্তব্যের সাথে একমত হলেও, প্রথম মন্তব্যের সাথে একমত নই। তাহলে কি বাংলাদেশীদের জন্য প্রবাসে রাজনীতির সংজ্ঞা খুঁজতে হবে রাজনীতির প্রচলিত সংজ্ঞার বাইরে? তবেই কি রাজনীতি contextual'এর আবরণ থেকে বেড়িয়ে আসবে?

প্রশ্নটি একটু ভিন্নভাবে করলে কেমন দাঁড়ায়! বাংলাদেশের কোন্ ধরনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশী রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিক হবে? তবে কি দেশে সেই ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, প্রবাসে দেশী রাজনীতি প্রাসঙ্গিকতা হারাবে? কেমন সে রাজনৈতিক পরিবেশ?

বিষয়টি অনুধাবনের তাগিদে সাধারণ মানুষের কয়েকটি সহজাত বৈশিষ্টের উপলব্ধি অত্যাৱশ্যক, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ স্বাতন্ত্র্য। যেমন, মানুষ মানুষকে, মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করে, যতক্ষণ না উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী কোন গোষ্ঠি অন্যভাবে প্রভাবিত করে। আর মানুষ মানুষকে, মানুষ হিসেবে গ্রহণ করার সহজ মানে হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এটা মানুষের সহজাত বৈশিষ্টের অন্যতম বৈশিষ্ট।

মানুষ সম্মান প্রত্যাশা করে একে অপরের কাছে। এটাও মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট। সামাজিক অবস্থানের বিন্যাশে যার যতটুকু প্রাপ্য, প্রত্যেকের ততটুকুই প্রত্যাশা। কোন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কাউকে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ দেওয়া, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এটা মানবাধিকারও বটে। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের এ সুযোগ দেয়ার সহজ অর্থ- গনতন্ত্র।

মানুষের কর্মস্থল কিংবা বসবাস পৃথিবীর যে প্রান্তেই হউক না কেন, সে খোঁজে তার শিকড়। এটা মানুষের আরও একটি সহজাত বৈশিষ্ট। সে কে? জানতে চায় নিজেকে। কি তার অতীত, বর্তমান? কি তার স্বপ্না? আর এই মানুষে মানুষে মিলে হয় সমাজ। সেখানে ভাষায় ঘটে আদান-প্রদান। গড়ে উঠে সম্পর্ক। সম্পর্ককে ঘিরে শুরু হয় বসবাস। আর বসবাসের পরিবেশ-পারিপার্শিকতা, যেমন জল, মাটি, বায়ু - এক কথায়, জলবায়ুর ছোঁয়ায় রূপ নেয় গায়ের রঙ, দেহের গড়ন, আহার-নিদ্রার অভ্যাস এবং পোশাক-আশাকের ধাঁচ। এ সবের প্রভাবে জন্ম নেয় আত্মপ্রকাশের ধরণ। যেমন, নিত্যের তাল ও ভঙ্গিমা; সঙ্গিতের সুর। আর এ সব মিলেই হয় সংস্কৃতি, যার নিত্যদিনের

প্রকাশ আর অভিজ্ঞতার আলোকে জন্ম নেয় একটি জাতির জাতীয় স্বপ্ন। যেমন, বাঙালি জাতি। জাতি স্বপ্নের এ উপাদানটি জাতির ইতিহাসের ধারাবাহিকতারই স্বরূপ।

তাহলে, মানুষ মূলত মানুষে – মানে ধর্মনিরপেক্ষতায়; মানুষের সম্মানে – মানে গনতন্ত্রে; মানুষের নিজ স্বপ্নায় – মানে বাঙ্গালিধ্বংস এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী। আর এই সব মূল্যবোধে এবং মূলধারা ৭১'রের স্পিরিটে জন্ম হয়েছে বাঙালি জাতির দিকনির্দেশনা। যদি কখনো বাঙ্গালির এসব সহজাত বিশ্বাসে গড়া জাতির দিকনির্দেশনার উপর আঘাত আসে? যদি তা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়? তবে কি এ সবার প্রতিবাদ-প্রতিকারের রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিক হবে?

বিষয়টি অনুধবনের সুবিধার্থে এখানে কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

- যখন বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতি হয়, তখন প্রবাসে এক শ্রেণী তাতে সমর্থন জোগায়। অন্য এক শ্রেণী মনে করে এ নিয়ে সময় ব্যয় করা নিরর্থক। তাদের মতে, স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর এ বিষয় তাৎপর্যহীন। তখন নীতিগত কারণে তৃতীয় কোন এক শ্রেণীকে স্ট্যান্ড নিতেই হয়।
- যখন স্বাধীনতা ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের আওতায় আনা হয়, তখন এক শ্রেণী তার বিরোধীতা করে; প্রবাসে প্রকাশ্যে মিটিং-মিছিল করে; সেই সাথে প্রবাসের কংগ্রেস কিংবা পার্লামেন্টের সদস্যের সাথে বিচার বন্ধের জন্য লবিং করে। অন্য এক শ্রেণী বিচার প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, ভ্রান্ত এবং আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন নয় বলে ধূম তুলে বিচারকে কন্ডোভার্শিয়াল করার প্রচেষ্টা চালায়। তখন নীতিগত কারণে তৃতীয় এক শ্রেণীকে স্ট্যান্ড নিতেই হয়।
- যখন প্রবাসে মসজিতে মসজিতে যুসুফ নামাজের পর লিফলেট বিলি করে এই বলে যে, বাংলাদেশে মোসলমানদের উপর অত্যাচার চলছে। অন্য এক শ্রেণীর এ নিয়ে কোন ভাবনা নেই। মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে নীতিগত কারণে তখন তৃতীয় কোন এক শ্রেণীকে স্ট্যান্ড নিতেই হয়।
- ২০০১'এর নির্বাচনের পর বাংলাদেশে ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের পরও প্রবাসে এক শ্রেণীর বাংলাদেশী যখন বলে – তেমন কিছুই ঘটেনি সেখানে। অন্য এক শ্রেণী তখন নিশ্চুপ। সেই সময় তৃতীয় কোন শ্রেণীর তো এ বিষয়ে স্ট্যান্ড নিতেই হয়।
- প্রবাসে এক শ্রেণী যখন 'জাতীয় শোক দিবসে' জন্মদিন পালনের আনন্দে মেতে উঠে, অন্য এক শ্রেণী যখন সিদ্ধান্তে 'সমদূরত্বতা' বজায় রাখে। তখন নীতিগত কারণে তৃতীয় কোন এক শ্রেণীকে স্ট্যান্ড নিতেই হয়।

আর এসব কারণেই প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় প্রবাসে দেশী রাজনীতির বিষয়টি। তবে সেই রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ-ধারণ কেমন হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে (যা পরবর্তি লেখার বিষয় বস্তু)। এখানে মূল প্রশ্ন - কারা এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত প্রবাসি বাঙ্গালি?

বাংলাদেশের সুধিজন প্রায়ই বলে থাকেন - 'নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হারলে, সারা বাংলাদেশ হারে'। তাহলে কি, বাঙ্গালির সহজাত বৈশিষ্ট্য আর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত? বিষয়টি পর্যালোচনার দাবী রাখে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ এই ২৬ বছর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে ছিল। কি দেখেছি তখন? শুরুতেই দেখি সামরিকতন্ত্র, যা চলে একাধিক পর্বে। দেখি, ধর্মীয় উগ্রপন্থিদের উত্থান। দেখি স্বাধীনতা বিরোধী এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধে অবিশ্বাসীদের ক্ষমতায় আহরন; দেখি ধর্মনিরপেক্ষতার উপর সরাসরি আঘাত। দেখি স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বাঙালি জাতি স্বপ্নার বিকৃতি। এক কথায়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬'এর ইতিহাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য অবক্ষয়ের ইতিহাস।

যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তা দেশের মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যে গড়া। যেমন, ধর্মনিরপেক্ষতা, গনতন্ত্র, বাঙালি জাতি স্বপ্না, সঠিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। এগুলোই হচ্ছে বাঙালি জাতির জাতীয় দিকনির্দেশনার ভিত্তি। অষ্টেলিয়া, ভারত বা বিলাত, এমনকি পাকিস্তানের জাতীয় দিকনির্দেশনায় কখনও আঘাত আসেনি। তাই তাদের দেশী রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিক নয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে যতদিন বাংলাদেশের মানুষের সহজাত মূল্যবোধ এবং সঠিক ইতিহাসের ভিত্তিতে জাতীয় দিকনির্দেশনা পুনরুজ্জীবিত এবং পুঃপ্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন এই ধারার দেশী রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিক থাকবে। পুঃপ্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে প্রাসঙ্গিকতা হারাবে, তার পূর্বে নয়।।

---